



কোয়ান্টাম বুলেটিন

জানুয়ারি ২০১৯

সবার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক



কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী,
আসসালামু আলাইকুম!
শুভ কোয়ান্টাম বর্ষায়ন!

২৬ পেরিয়ে আমরা পদার্পণ করছি ২৭ তম বর্ষে। সিকি শতাব্দী ধরে আত্মনির্মাণ ও সৃষ্টির সেবার মধ্য দিয়ে দেশের জনশক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তরে যে অনন্য ভূমিকা রেখেছে কোয়ান্টাম, তার নেপথ্য নায়ক আপনারাই। সবরকম ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ঘরে ঘরে আপনারা কোয়ান্টামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন বলেই সম্ভব হয়েছে এ ইতিবাচক পরিবর্তন। সুখী জীবনের কোয়ান্টাম সূত্রগুলোর চর্চা আজ আমাদের দেশেই যে শুধু বেড়েছে তা নয়, বরং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশ্বের প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমে। আমাদের পাঠ্যসূচিতেও এর অন্তর্ভুক্তি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ কৃতিত্বও আপনাদেরই।

কোয়ান্টাম বর্ষ ২৬ বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতা সৃষ্টিতে আপনাদের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অভিষাপ সম্পর্কে আজ শুধু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষই সচেতন হন নি, এর প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বে! নড়ে উঠেছে ফেসবুকের ভিত। স্মার্টফোনরূপী শয়তানের বাস্তব ব্যবহার এবং সন্তানকে এ থেকে বিরত রাখতে বেড়েছে সচেতনতা।

দেশ-বিদেশের বহু স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার এখন নিষিদ্ধ। এই অভাবনীয় রূপান্তরও আপনাদের সজ্ঞবদ্ধ ও ঐকান্তিক প্রয়াসেরই ফল।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এই প্রথমবারের মতো সফল হয়েছে একবছরে লক্ষাধিক ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করতে। সম্মানিত রক্তদাতাদের আন্তরিক দানেই সম্ভব হয়েছে এ অসামান্য অর্জন। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

আমরা জানি, জীবন মানে ক্রমাগত এগিয়ে চলা। মানুষের আস্থা এখন আমাদের ওপর। তারা জানে কোয়ান্টাম শুদ্ধাচারের

কথা বলে, কল্যাণের কথা বলে। শান্তির কথা বলে। বলে দেশকে ভালবাসার কথা। এ প্রেক্ষিতে আমরা চাই শান্তি শুদ্ধাচার ও ভালবাসার সূত্র সবার কাছে পৌঁছে দিতে। তাই 'নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম'-এই স্টিকারটি পৌঁছে দিতে হবে দেশের সকল তরুণের হাতে। পরিবারে ও সমাজে অনাবিল শান্তির জন্যে কারো সাথে দেখা হলেই বলতে হবে 'আসসালামু আলাইকুম'-আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

এখন থেকে ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দিন। শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক আমাদের জীবন। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন!

[বর্ষায়নে গুরুজী ও মা-জীর
শুভেচ্ছা বাণী]



মহীয়সী ভ্যালেরি টেইলর মানবতার শক্তিতে মানুষের পাশে

ব্রিটিশ তরুণী ভ্যালেরি টেইলর। ২৫ বছর বয়সে ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে তিনি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসেন ১৯৬৯ সালে, একটি আন্তর্জাতিক স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে। ১৫ মাস পর নিজ দেশে ফিরে গেলেও আবার এলেন ১৯৭১ সালে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তখন অসংখ্য যুদ্ধাহত মানুষ।

সেই ক্রান্তিকালে তিনি অনুভব করলেন এদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ। ভ্যালেরি সিদ্ধান্ত নেন-এদেশের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন সেন্টার ফর দ্য রিহাবিলিটেশন অব প্যারালাইজড বা পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি), যা আজ একটি আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রতিষ্ঠান। মানবসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে বহু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ প্রদত্ত অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড, প্রিন্সেস ডায়ানা গোল্ড মেডেল, ডা. এম আর খান ও আনোয়ারা ট্রাস্ট গোল্ড মেডেল এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ৮ জানুয়ারি ২০১৮ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। তার বক্তব্যে উঠে আসে সিআরপি-র পথচলা নিয়ে নানা প্রসঙ্গ।

নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন বার বার

সিআরপি-র শুরুটা ১৯৭৯ সালে-সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিত্যক্ত সিমেন্ট গোড়াউনে, চার জন রোগী নিয়ে। বছর কয়েক পরে হাসপাতালের প্রয়োজনে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। সিআরপি নিয়ে শুরু হয় ভ্যালেরির তপস্বীর জীবন। দুস্থ রোগীদের কেউ সহজে জায়গা না দিলেও তাদের কখনো ছেড়ে যান নি তিনি। বেশ কয়েকবার সিআরপি-কে বিভিন্ন স্থানে সরাতে হয়েছে। হাসপাতালের জিনিসপত্র, রোগী-এসব নিয়ে বার বার স্থান পরিবর্তন ছিল এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা।

তবে অদম্য ভ্যালেরি মনে করেন, এর মধ্য দিয়ে তারা একটু একটু করে সিআরপি-কে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দৃঢ় হয়েছেন। অবশেষে ১১ বছর পর ১৯৯০ সালে সাভারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো সিআরপি-র কেন্দ্রীয় অফিস। বর্তমানে মিরপুর, রাজশাহী, সিলেটসহ দেশের ১২টি জেলা শহরে এর শাখা রয়েছে।

সমর্মিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সিআরপি। ঠেলাগাড়ি চালক, রিকশা চালক, রাজমিস্ত্রীদের মতো দরিদ্র মানুষদের অনেকেই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে এখানে আসে। অর্থাভাবের কারণে তাদেরকে বড় হাসপাতালগুলো ভর্তি করাতে চায় না। ভ্যালেরি অসহায় এ রোগীদের ঠাই দেন তার প্রতিষ্ঠানে। ধৈর্য, মমতা, যত্ন নিয়ে এদেরকে সুস্থ করে তোলা হয়। এরপর স্বাবলম্বী হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যবস্থা করা হয় তাদের পুনর্বাসনের।

মূলমন্ত্র : স্বনির্ভরতা

এখানকার রোগীদের চিকিৎসার জন্যে যে ধরনের অত্যাধুনিক সরঞ্জামের প্রয়োজন তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। হাতের কাছে যে কাঁচামাল পাওয়া যায়, তা দিয়েই অধিকাংশ চিকিৎসা-সরঞ্জাম তৈরি করেন সিআরপি-র কর্মীরা। কারণ এটা সাশ্রয়ী এবং রোগীদেরও প্রতিকূলতা জয় করতে শেখায়।

যেমন, হুইল চেয়ার বানানোর জন্যে তারা ব্যবহার করেন সাইকেলের চাকা, রিকশার যন্ত্রাংশ। রোগীরাও এগুলো তৈরি করতে শেখে। ফলে কখনো প্রয়োজন হলে যান্ত্রিক ত্রুটি নিজেরাই মেরামত করতে পারে। এ-ছাড়া দরিদ্র রোগীদের জন্যে রয়েছে বিদ্যুৎবিহীন মাটির বাড়িতে জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ। এখানে নিজের বাড়ির মতো বাঁশ, কাঠ, মাটির ঘরের দেয়াল ধরে তারা হাঁটতে শেখে, কাজ করতে শেখে। ফলে তারা যখন বাড়ি ফিরে যায়, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে সহজেই।

সেবাগ্রহীতারা আজ সেবা দিচ্ছেন

সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ পেলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরাও স্বাভাবিক কর্মময় জীবনযাপন করতে পারেন। সিআরপি-তে এসে সুস্থ হয়েছেন, এমন অনেকেই এখন এ প্রতিষ্ঠানেই কাজ করছেন। কেউ রিসিপশনিস্ট, কেউ অসুস্থদের থেরাপি দিচ্ছেন, কেউ অন্যদের সাহস জোগাচ্ছেন। নতুন রোগীদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই কর্মীরা যখন নিজের সুস্থতার কথা রোগীদের বলেন,

শারীরিক অনুশীলনে নিয়ে যান, জীবনকে নতুন করে শুরু করতে বলেন, তখন রোগীরা অনেক বেশি উজ্জীবিত হয়।

বাংলাদেশে অর্ধশতাব্দীকাল কাজের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভ্যালেরি টেইলর বলেন, ‘আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ করে তোলার পর পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষদের স্বাবলম্বী করে তোলা। এদের মধ্যে শিক্ষিতদের আমরা বলি-এসো, বাচ্চাদের লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করো। আর অক্ষরজ্ঞানশূন্য হলে তাদের বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ শেখাই। এতে তারা নিজের ও পরিবারের দায়িত্ব নিতে



সিআরপি-তে সুস্থ হয়ে একজন রিসিপশনিস্ট হিসেবে কাজ করছেন

সক্ষম হন। সমাজের বোঝা হয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হয় না। কাজের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের অর্থ নতুন করে খুঁজে পায়। আসলে কাজই আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে চলাচলে অক্ষম, অসহায়, ব্যথাক্লিষ্ট মানুষেরা যখন সিআরপি-তে আসেন, তখন তারা জীবনহীন। আমাদের এখান থেকে সেবা নিয়ে এ রোগীরা স্বাবলম্বী হয়ে বাড়ি ফিরে যান। এই রূপান্তর দেখাটা স্বর্গীয় আনন্দের। বার বার এই আনন্দের দেখা পেতেই আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। ঈশ্বর যদি আবার জন্ম দেন, তাহলে বাংলাদেশের মাটিতেই আমি কাজ করতে চাই।’

আমরা গর্বিত যে, এদেশে তাঁর জীবনভর ত্যাগ ও অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে ভ্যালেরি টেইলরকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন।

হে তরুণ! আপনিও পারবেন



লুইস ব্রেইল। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পড়ালেখার সুবিধার্থে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ব্রেইল পদ্ধতির জনক। তিনি নিজেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছিলেন। ১০ বছর বয়সে তার মা-বাবা তাকে ভর্তি করান ‘রয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর ব্লাইন্ড ইয়োগ’ নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সেসময় অন্ধদের জন্যে পড়া ও লেখার প্রচলিত পদ্ধতি ফলপ্রসূ ছিল না মোটেও। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই পড়ালেখা শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলত।

লুইস ব্রেইল পড়ালেখার ফাঁকে কাজ শুরু করলেন এই মেথড নিয়ে। তার অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ১৮২৪ সালে কার্যকর একটি মেথড হিসেবে আবিষ্কৃত হলো ব্রেইল পদ্ধতি। লুইস ব্রেইলের বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর। তার কিশোর বয়সের একটি অনন্য উদ্যোগ আজও বিশ্বজুড়ে শিক্ষার আলো দিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের।

‘কতটা কাজ করছি, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো কতটুকু ভালবাসা নিয়ে কাজটা করছি। কী পরিমাণ দিচ্ছি, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো কতটা মমতা নিয়ে দান করছি।’—এই কথাগুলো বলেছেন মহীয়সী মাদার তেরেসা। রোগগ্রস্ত ও বক্ষিতের পাশে দাঁড়ানোকেই সত্য বলে জেনেছেন তিনি, মানুষের ধর্মে-বর্ণে-জাতে ভেদাভেদ করেন নি কখনো।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি আত্মনিয়োগ করেন মানবতার সেবায়। শুরুটা ছিল খুব সাধারণ। কিন্তু তারুণ্যের একটি সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বিশ্বে মমতা ও করুণার আরেক নাম হয়ে উঠলেন মাদার তেরেসা। শুষ্ক পেল অসহায় লাখো মানুষ।

মানুষের কল্যাণে এমন পদক্ষেপগুলোই সময়কে অতিক্রম করেছে। আর যুগে যুগে তরুণেরা অগ্রণী হয়েছে অন্যের জন্যে কিছু করার প্রয়াসে।

তরুণরা পারে, কারণ—

- তারা বদলে দিতে চায়
- তারা সৃজনশীল ও উদ্যমী
- লেগে থাকতে পারে
- রয়েছে সংবেদনশীল মন
- নেই হারানোর ভয়, নেই ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা
- সবকিছু দেখতে পারে প্রত্যাক্ষার দৃষ্টিতে

এ বৈশিষ্ট্যগুলো কৈশোরে ও তারুণ্যে সহজাত। চেনা জগতকে সে বদলে দিতে চায়। সেইসাথে নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতাও বিরাজ করে এ সময়েই। উদ্যম, স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতা আর অভাবনীয় সব আইডিয়া তার নিত্যসঙ্গী। সে বড় স্বপ্ন দেখতে পারে এবং স্বপ্ন পূরণের জন্যে লেগে থাকতে পারে।

হারানোর ভয় তারুণ্যকে স্পর্শ করতে পারে খুব সামান্যই। তাই চারপাশে বক্ষিত মানুষের কষ্টগুলো তাকে ভাবায়। যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে উঠে সে বিশ্বাস করতে পারে, যে-কোনো বাধা অতিক্রম করতে চায় প্রত্যাশা আর সাহস দিয়ে।

স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায় কেন?

কৈশোরে ও তারুণ্যে অধিকাংশ মানুষই স্বপ্ন দেখে দৃষ্টি-বক্ষিতের জন্যে কিছু করার। কেউ স্কুল গড়তে চায়, কেউ হাসপাতাল, কেউ-বা বুদ্ধাশ্রম। তরুণ মাত্রই স্বপ্ন দেখে—সমাজের অসঙ্গতিগুলো দূর করতে হবে, দেশটাকে গড়তে হবে।

ইতিহাস বলে, বড় স্বপ্নকে যারা অলীক-অসম্ভব মনে করেন নি, তারাই সফল ও স্মরণীয় হয়েছেন। অন্যদিকে সেই মানুষগুলো হারিয়ে যায়, যাদের জীবন শুধু নিজস্ব সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া কিংবা পেয়ে হারানোর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তারুণ্যদীপ্ত বড় স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায়, যখন মানুষ ভাবতে শুরু করে—যেদিন অনেক অর্থসম্পদ হবে, সেদিন ভালো কাজ করব। প্রতিষ্ঠা পাওয়া আর সম্পদ গড়ার বৃত্তে এভাবেই ইতি ঘটে হাজারো স্বপ্নের। অথচ মানুষের জন্যে কাজ করতে প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং সমমনা মানুষের সাথে সম্মিলিত থাকা।

বেরিয়ে আসতে হবে ‘আমি’র বৃত্ত থেকে

একজন মানুষ তখনই দৃষ্টিহীন, যখন সে শুধু নিজের দুঃখ নিয়েই চিন্তা করে আর ব্যাকুল হয় কেবল নিজের সুখের জন্যেই। এ দৃষ্টিভঙ্গিই তার একাকীত্বের দ্বার উন্মোচন করে।

অথচ বেঁচে থাকাটা কখনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। ডেনমার্কের হ্যাপিনেস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণায় উঠে এসেছে—ভালো থাকার অন্যতম মাপকাঠি হলো পারস্পরিক সম্পর্কগুলো। যিনি পরিবার-পরিজনসহ চারপাশে সবার সাথে জীবনটা ভাগ করতে শেখেন, তিনি—ই সুখী।

সেইসাথে সমাজের কল্যাণে স্বেচ্ছাশ্রমে জড়িত থাকেন যারা, তাদের ভালো থাকার পরিমাণ অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। হ্যাপিনেস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান মেইক উইকিংস-এর ভাষ্য হলো—সাধারণভাবে মনে করা হয়, সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত থাকার মধ্য দিয়ে আমরা অন্যের উপকার করি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, এ ধরনের কাজে যুক্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি সুফল পাই আমরা নিজেরা।

প্রথমত, এর মাধ্যমে আমরা সমমনা মানুষের সান্নিধ্য পাই। দ্বিতীয়ত, সেবার সূত্রে কিছু মানুষের সাথে গড়ে ওঠে এক ধরনের নিঃস্বার্থ সম্পর্ক, যা দেয় পরিতৃপ্তি। তৃতীয়ত, জীবনে যা-কিছু পেয়েছি, তার জন্যে আমরা আরো বেশি কৃতজ্ঞ হতে শিখি। কারণ সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের আরো অনেক মানুষের জীবন দেখার সুযোগ পাই খুব কাছ থেকে। (রিডার্স ডাইজেস্ট, জুলাই ২০১৮)

চাই সুদূরপ্রসারী মনছবি ও সম্ভবদ্বতা

মনছবি বা লক্ষ্যই হলো সাফল্যের বীজ। ভবিষ্যতের কল্পনা বা স্বপ্ন যখন বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়, তা-ই

পরিণত হয় মনছবিতে। একজন লক্ষ্যভিসারী মানুষ জানান তার করণীয় সম্পর্কে। তাই আপাতত ব্যর্থতা তাকে হতাশায় নিমজ্জিত করতে পারে না; বরং নতুন কর্মপরিকল্পনা আর উদ্যমে তিনি শুরু করতে পারেন বার বার। এজন্যেই প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি আর কিছু পণ্যের মাঝে বন্দি থাকার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেইসাথে সম্ভবদ্বতা থাকা প্রয়োজন ইতিবাচক ও আশাবাদী মানুষের সাথে।

তরুণরা সুখী তাদের অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণে আর প্রবীণরা সুখী হন পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে। কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের গবেষক ড. লিসা এফ কার্ভার-এর মতে, ‘তারুণ্যের ইতিবাচক দিক হলো, সে সাফল্যকে অনিবার্য মনে করে। কিন্তু প্রবীণরা জীবনের নানা উত্থান-পতন দেখেছেন। তাই তারা জানেন, প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই ভালো বিষয়গুলোর দেখা মেলে।’

তাই কোনো প্রতিকূলতায় মুষড়ে পড়া নয়, তা অতিক্রমে প্রয়োজন নিরলস প্রয়াস। এর সহায়ক শক্তি হলো ধ্যান বা মেডিটেশন।

ধ্যান ও সমমর্মিতায় বিকশিত হোক তারুণ্য

সাম্প্রতিক সময়ের পরিচিত এক নাম একাপল চ্যাট্‌হাওং। থাইল্যান্ডে এক পাহাড়ের গুহায় ১২ জন কিশোর ফুটবলারসহ আটকে পড়েছিলেন আড়াই সপ্তাহের বেশি। তিনি ছিলেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পরবর্তীতে হয়েছেন ফুটবলের কোচ।

অন্ধকার গুহা থেকে কিশোরদের উদ্ধার করার পর ডুরুরিরা সাক্ষ্য দিয়েছেন—কিশোরদের বাঁচাতে কোচ একাপল নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। সঙ্গে যেটুকু খাবার ছিল, সবাইকে প্রতিদিন একটু একটু করে ভাগ করে দিয়েছেন। আর একাপল নিজে বেঁচে থেকেছেন পাহাড়ের গা বেয়ে চুইয়ে পড়া পানি পান করে। মনোবল ধরে রাখার জন্যে তিনি কিশোরদের মেডিটেশন চর্চা করিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে এসব কোনোকিছুই কারো অজানা নয়।

একাপল আজ সারাবিশ্বেই সমমর্মিতার এক অনন্য উদাহরণ। কোচ হিসেবে তিনি ছাত্রদের দিতে চেষ্টা করেছেন সর্বোচ্চটুকু। অন্ধকার গুহায় শুধু খেয়াল রাখাই নয়, ধ্যানের শিক্ষাও দিয়েছেন কিশোরদের, যা তাদের বিশ্বাসকে বলীয়ান করেছে।

বিশ্বজুড়ে তরুণ প্রজন্ম

জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে কিশোর-তারুণ্যের সংখ্যা ১.৮ বিলিয়ন, যাদের বয়স ১০ থেকে ২৪ বছর (৯ আগস্ট, ২০১৬)। এ তরুণরা পড়ালেখা করছে, কাজ করছে আর খুঁজে ফিরছে জীবনের উদ্দেশ্য। গবেষণায় বলা হচ্ছে, পৃথিবী নামক গ্রহটি এর আগে কোনো যুগেই দেখে নি এ বিপুল সংখ্যক তরুণ প্রাণ। তবে এরা বেড়ে উঠছে এমন এক সময়ে যখন পৃথিবী বাঁক বদলাচ্ছে—পুরনোর খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রহর গুনছে এক নতুন পৃথিবী।

সেই নতুন পৃথিবী যেন হয় এক মানবিক মহাসমাজ, যেখানে প্রত্যেকের একমাত্র পরিচয় হবে—সে মানুষ। যেখানে জাতিধর্মবর্ণের সীমারেখা স্তান হয়ে যাবে সমমর্মিতার ধারায়।

হে তরুণ! এ দায়িত্ব আপনার। কারণ যুগে যুগে তরুণরাই দায়িত্ব নিয়েছে। আর জ্ঞানের আলোয় দূর করতে চেয়েছে সকল অন্ধকার। তাই জ্ঞানে-অভিজ্ঞানে নিজেকে গড়ে তুলুন আত্মপ্রত্যয়ী ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসেবে। সম্ভবদ্বতাবে অংশ নিন সৃষ্টির সেবায়।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৯ গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

মেধা ও যোগ্যতা রয়েছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই। মেধাকে যিনি কাজে লাগাতে পারেন, তিনি জীবনে সফল হন এবং নিজের পরিচয় সৃষ্টি করেন। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, এজন্যে প্রয়োজন আত্মনিমগ্নতা বা মেডিটেশন চর্চা। আর মেডিটেশন শেখার সর্বাধুনিক ও সহজ প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম মেথড। শিক্ষা-ক্যারিয়ারে সাফল্য, ব্যবসায় উন্নতি, শারীরিক সুস্থতা এবং ব্যর্থতাকে জয় করে জীবনে নতুন গুরুর পথ দেখায় কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। ২৬ বছরে সম্পন্ন হয়েছে এ কোর্সের ৪৫৩টি ব্যাচ। অংশ নিয়েছেন লাখো মানুষ, পেয়েছেন আরাধ্য সাফল্য। এমনই কয়েকজনের অনুভূতি এখানে দেয়া হলো—

কিশোর-তরুণদের অংশগ্রহণ দেখে ভালো লেগেছে

অধ্যাপক ডা. সজল মজুমদার



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার আগে ভাবছিলাম—এখানে এসে আমি কী শিখব? কিন্তু যা দেখেছি এবং শুনেছি, আমি বিস্মিত! এ কোর্সটিকে সময় ও নিয়মানুবর্তিতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়েছে। চার দিন ধরে দীর্ঘ সময়ের ক্লাসগুলো এতটা আনন্দদায়ক হতে পারে—আগে এমন অভিজ্ঞতা আমার হয় নি।

প্রায়শই আমরা দেশ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু কোর্সের আলোচনায় বার বার আশাবাদের কথা বলা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এ কোর্সে যারা মেডিটেশন শিখেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের মানসিক শক্তিতা তুলনামূলক বেশি হবে।

এখানে কিশোর-তরুণদের অংশগ্রহণ দেখে আমার ভালো লেগেছে। আগামীতে তারাি এ দেশের নেতৃত্ব দেবে। এ কোর্সে এসে তারা সময় এবং নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখছে। আশা করি, আমাদের দেশটি শান্তিময় এবং ন্যায়পরায়ণ দেশ হিসেবে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে।

[বিভাগীয় প্রধান, শিশু সার্জারি বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ৪৫৩ ব্যাচ]

তিন জন চিকিৎসকই বললেন—মেডিটেশন করুন

মো. কাজী রেজুয়ান হোসেন



পাঁচ বছর আগে আমি জানতে পারলাম, আমার মৃগীরোগ হয়েছে। ডাক্তারের একথা শুনে আমি মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়লাম। অসুস্থতার কারণে আমি সবসময় বিব্রত বোধ করতাম। পুকুরে নামা যাবে না, আগুনের সামনে যাওয়া যাবে না ইত্যাদি বিভিন্ন বিধিনিষেধ মেনে চলতে হতো। চিকিৎসকের পরামর্শে আমাকে উচ্চমাত্রার ওষুধ খেতে হতো। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হতে পারি নি।

আমি এখন রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি

ডা. সুলতানা রাজিয়া

ছোটবেলা থেকেই মা বলতেন, আমার মেয়েটার খুব জেদ। আমার স্বামীও প্রায়ই বলেন, তুমি মাথাটাকে ঠান্ডা করো। কিন্তু আমি তাদের কোনো কথাই শুনতাম না।

একদিন আমার সাত বছরের সন্তান আমাকে বলল, ‘মা! তোমার এত রাগ কেন?’ তার এ প্রশ্নটি আমাকে খুব ভাবিয়েছে। এই ছোট শিশুটিও আমাকে বুঝিয়ে দিল, মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। সেদিনই প্রথম অনুভব করলাম, এটা আমার বড় সমস্যা। এ থেকে বের হওয়ার জন্যে আল্লাহকে কাছে একটা পথ চাইলাম।

এর মধ্যেই পরিচিত একজন আমাকে কোয়ান্টামের কিছু বই পড়তে দিলেন। তারপর এক শুক্রবার কোয়ান্টামের সাদাকায়নে গেলাম এবং উপলব্ধি করলাম, এ কোর্সটি আমার করা উচিত।

যে রাগ আমি এতদিন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি, তা আমি কোর্সের এই চার দিনে অনেকটাই পে রেছি। গুরুজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ এটা সম্ভব হয়েছে শুধু মেডিটেশনের জন্যেই।

[মেডিকেল অফিসার, ডব্লিউস জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা। ৪৫৩ ব্যাচ]

কোনো উপায় না পেয়ে চিকিৎসা করতে ভারতে গেলাম। চেন্নাইয়ের বিখ্যাত তিন জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলাম। তারা প্রত্যেকেই বললেন, মেডিটেশন করুন। রোগটা আপনার শরীরে নয়, এটা আপনার মনের রোগ।

দেশে ফিরে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! চার দিন মেডিটেশন করে আমি অনেকটা সুস্থ অনুভব করছি। অথচ আগে আমার সবসময় মনে হতো, আমি অসুস্থ। এই নেতিচিন্তাও এখন আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি।

মেডিটেশনের এই শক্তির কথা আমি আমার ছাত্রদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে চাই। কারণ বর্তমান সময়ে তরুণদের হতাশা অনেক বেশি। পড়ালেখার পাশাপাশি তারা যদি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে, হতাশা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

[সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। ৪৫২ ব্যাচ]

এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা

ইঞ্জি. মো. আবদুল মালেক সিকদার



আমি পেশায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সারা জীবন অনেক অট্টালিকা তৈরি করেছি কিন্তু কখনো মনের বাড়ি তৈরি করতে শিখি নি। কোর্সে এসে মেডিটেশনে যখন মনের বাড়ি নির্মাণ করতে হলো, অনুভব

করলাম—আমাদের অন্তর কত ঐশ্বর্যশালী! মন এবং মনের শক্তি সম্পর্কে আমার অধিকাংশ মানুষ খুব সামান্যই জানি। শুধু দেহের ওপরে নয়, আমাদের আচার-আচরণ থেকে শুরু করে পুরো সমাজব্যবস্থার ওপর মনের প্রভাব রয়েছে। কোয়ান্টামে মনোদৈহিক বিষয়গুলোর গভীর অনুশীলন ও চর্চা দেখে আমার মনে হয়েছে, মানুষের মনোজগতে কোয়ান্টাম এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা।

সেইসাথে নিয়মিত দানে উৎসাহিত করা হচ্ছে এই কোর্সে। দানের অর্থ জমা রাখার জন্যে সবার কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে একটি করে মাটির ব্যাংক। আর এ অর্থে বান্দরবান লামায় আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে হাজারো বঞ্চিত শিশু। আমি বলব, এটা আসলে ভালবাসার ব্যাংক।

[এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার (অব.), গণপূর্ত অধিদপ্তর, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। ৪৫৩ ব্যাচ]

আমি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারব

মোছাম্মত মৌসুমী



দারিদ্র্যের কারণে ছোটবেলা থেকেই আমাকে অন্যের বাসায় কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু আমার হাতে-পায়ে সবসময় খুব ব্যথা হতো। এ কারণে আমি কাজগুলো ঠিকমতো করতে পারতাম না, শুধু ঘুম পেত। কাজ করতে করতে প্রায়ই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

আমার এক বড় আপার উৎসাহে আমি কোর্সে এসেছি। কারণ আমি আমার জীবনটাকে পরিবর্তন করতে চাই। তিনি আমাকে কোয়ান্টামের মাটির ব্যাংকে দানের কথা বলেছেন। প্রতিদিন দান করার ফলে আমি অনেক উপকার পেয়েছি।

কোর্সে মেডিটেশন করে আমার অতিরিক্ত ঘুমের সমস্যাটি আর নেই। হাত-পায়ের ব্যথাও দূর হয়েছে। আগে কোনোকিছুই আমার ভালো লাগত না। এ সমস্যাও এখন নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমার দুঃখের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে আমি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারব।

এতদিন ভাবতাম, আমি এতিম, অসহায়। কিন্তু এখানে এসে আমি বিশাল এক পরিবার পেয়েছি, তা হলো কোয়ান্টাম পরিবার।

[গৃহকর্মী। ৪৫৩ ব্যাচ]

এ জ্ঞান আমি রোগীদের কল্যাণে কাজে লাগাব

ডা. পারুল আক্তার



একজন গাইনি বিশেষজ্ঞ হওয়ায় আমাকে প্রায়ই রোগীদের করণ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার পাশাপাশি আমি রোগীর সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং করার চেষ্টা করি। কিন্তু একসময় খেয়াল করলাম, রোগীদের সমস্যার ভেতর ডুব দিতে আমার আর ভালো লাগছিল না। দিন দিন আমি রোগী দেখাও কমিয়ে দিতে লাগলাম।

এ সমস্যার পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। দুমাস আগে আমি পায়ে অনেক ব্যথা পেয়েছিলাম। একমাস বিশ্রামে থেকেছি। একটু সুস্থ হলেও কিছুদিন পর ব্যথাটা আবার বেড়ে গেল। এতদিনের কর্মব্যস্ত ও ইতিবাচক জীবনে একটা ধাক্কা খেলাম। দৈনন্দিন কাজগুলো জমে গেল। সবকিছু এলোমেলো লাগছিল। ব্লাড প্রেশারও বেড়ে গেল। বার বার আমি ডাক্তারের কাছে যেতে শুরু করলাম।

আমার এমন অবস্থা দেখে পরিচিত এক সিনিয়র ডাক্তার মেডিটেশন করার পরামর্শ দিলেন। কোর্সে এসে দেখলাম, গভীর ও জটিল জীবনদর্শনগুলো এখানে খুব সহজ করে বলা হয়েছে।

এখান থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলাম, তা আমাকে মনের দিক থেকে আরো শক্তিশালন করবে। এ জ্ঞান আমি পরিবার-আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মী এবং রোগীদের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারব। এ কোর্সে এসে আমি অভিজ্ঞত। আমি এখানে আবার আসতে চাই।

[সহকারী অধ্যাপক, গাইনি বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। ৪৫৩ ব্যাচ]

ডাক্তার কন্যার উৎসাহে কোর্সে এসেছি

দিলরুবা তাহের

প্রায় ২০ বছর ধরে আমি মাথাব্যথায় ভুগছিলাম। এটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তেমন কোনো লাভ হয় নি। আমার মেয়ে একজন ডাক্তার। তার উৎসাহে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসেছি। সে সবসময় আমাকে বলেছে, মেডিটেশন করলে আমি সুস্থ হয়ে যাব। কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে গেল।

গত তিন বছর ধরে আমি রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারি নি। কোর্সে মেডিটেশন করে আমার ঘুমের সমস্যা দূর হয়েছে। মাথাব্যথাও আর অনুভব করছি না। আমি এখন শারীরিক ও মানসিকভাবে বেশ উৎফুল্ল বোধ করছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

[গৃহিণী। ৪৫৩ ব্যাচ]

বার্ষিক্য ও অবসরের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির পথ পেয়েছি

আহসান উল্লাহ



মেথড কোর্সটি করলেন। তার সাথেই আমি প্রথম সাদাকায়নে গেলাম। সেখানে মেডিটেশন করে এ কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ হলাম।

এখানে আসার পরে জীবনযাপনের বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি জানলাম। ৬৬ বছর বয়সে এসে যেন জীবনে নতুন উদ্যম পেলাম। বার্ষিক্য এবং অবসরের নিঃসঙ্গতা এখন আর আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এ-ছাড়া কোয়ান্টামের মতো একটি বড় পরিবার আমি পেয়েছি, যেখানে অবসরের সময়গুলো আমি কাজে লাগাতে পারব।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি গুরুজীকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই। কারণ মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মত্যাগের স্মরণে তিনি ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি উৎসর্গ করেছেন।

[মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। ৪৫৩ ব্যাচ।]

স্মার্টফোন বিক্রির টাকায় এ কোর্সে ভর্তি হলাম

মো. মোছাদ্দেক হোসেন



ছয় মাস আগে আমার বৃত্তির টাকা দিয়ে আমি একটি স্মার্টফোন কিনি। তখন থেকেই আমার পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যেতে শুরু করল। পড়তে বসলেই বিভিন্ন চিন্তা মাথায় আসত, এক

ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতাম। সবসময় শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করতে ইচ্ছা হতো।

সারাদিন ফেসবুক, ইউটিউব অথবা গেম নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। দিনে প্রায় ১২ ঘন্টাই আমি স্মার্টফোনের পেছনে ব্যয় করছিলাম। গত ছয় মাস আমি রাত দুটার আগে কখনো ঘুমাতে পারি নি। একদিন হঠাৎ মনে হলো, আমি এসব কী করছি!

ভাবলাম এই স্মার্টফোনই আমার যত সমস্যা সৃষ্টির কারণ। তাই এটা দিয়েই আমি সমাধান বের করব। স্মার্টফোনটি বিক্রি করে দিলাম। সেই টাকা দিয়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে ভর্তি হলাম। দুই বছর আগে আমার ভাইয়ের কাছে এ কোর্সের কথা শুনেছিলাম।

কোর্সে এসে চাচুয়াল ভাইরাস সম্পর্কে আরো সচেতন হয়েছি। আসলেই স্মার্টফোন মানুষের ঘুম কেড়ে নেয়। এ-ছাড়া মেডিটেশন করে আমার নয় বছরের মাইগ্রেনের সমস্যাও দূর হয়েছে।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, ধাপ সাতগাড়া মডেল কামিল মাদ্রাসা, রংপুর। ৪৫৩ ব্যাচ]

কোয়ান্টামের বাণী ছড়িয়ে পড়লে দেশ সমৃদ্ধ হবে

শাহ আলমগীর

যারা আমাকে এ কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। এখানে আমার আরো আগেই আসা উচিত ছিল।

কোর্সে বলা হয়েছে, জাতি হিসেবে আমাদের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ। কিন্তু বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা নেতিবাচক হয়ে গেছে। এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া দরকার। কোয়ান্টাম যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা সমাজের সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারলে আমাদের কোনো হতাশা থাকবে না।

পৃথিবীতে সাতশ কোটি মানুষের বসবাস। বেশিরভাগ মানুষই শুধু পেতে চায়। যার এক লক্ষ আছে সে এক কোটি চায়। যার এক কোটি আছে সে চায় একশ কোটি। হাজার কোটি হওয়ার পরেও বলে আমার লাখো কোটি দরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কোনো অর্থসম্পদ নিয়ে যেতে পারে না।

খুব অল্প মানুষই সমাজ ও দেশ নিয়ে ভাবেন। আমরা সমাজের যত রূপান্তর দেখেছি, তা সেই অল্প সংখ্যক মানুষই করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, গুরুজী তাদের একজন এবং তিনি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তা করে যাচ্ছেন। কোয়ান্টামের বাণী যত ছড়িয়ে পড়বে আমাদের দেশ তত সমৃদ্ধ হবে এবং সামনে এগিয়ে যাবে।

[মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট। ৪৫২ ব্যাচ]

নিজেকে ভালবাসতে শিখলাম

আফরোজা মুন্সী



২০১২ সালে আমার ব্রেন টিউমার অপারেশন হয়। এর দুই বছর পর আমাকে রেডিওথেরাপি নিতে হলো এবং ২০১৭ সালে কেমোথেরাপি নিলাম। অসুস্থ হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, আমার জীবন আর

আগের মতো নেই। বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

গত দেড় বছর হলো চাকরিও করছি না। লেখালেখি পছন্দ করি বলে কষ্টের কথাগুলোই শুধু লিখতাম। মারা যাওয়ার আগেই চারপাশের মানুষের নেতিবাচক কথা আমাকে মেরে ফেলেছিল।

কোর্সে এসে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। আসলেই মানুষের কথা শুনে কোনো লাভ নেই। এখানে এসে আমি নিজেকে ভালবাসতে শিখেছি। বিশ্বাস করতে পারছি, আমার জীবন আমি আবার গড়তে পারব। এখন থেকে কোনো নেতিবাচকতাকে আর প্রশয় দেবো না। আমি উপলব্ধি করেছি, মৃত্যুকে ভয় করা অর্থহীন। কারণ সবাইকে মারা যেতে হবে। পৃথিবীতে আমি যদি ভালো কিছু করে যেতে পারি, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সফলতা।

[লেখিকা। ৪৫৩ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : নিজেকে ইচ্ছামতো চালাতে পারি না কেন?

উত্তর : ইচ্ছামতো চালাবেন কেন? নিজেকে নিয়মমতো চালাবেন সবসময়। স্বেচ্ছাচারিতা জীবনে কোনো কল্যাণ নিয়ে আসে না। কারণ স্বেচ্ছাচারী মানুষের কোনো দায়িত্বজ্ঞান বা জবাবদিহিতা থাকে না। নিজের প্রতিও না, অন্যের প্রতিও না। সবসময় মনে রাখবেন, জীবনটাকে ইচ্ছামতো চালাতে গেলে আপনি হোঁচট খাবেন, ভুল করবেন। যে কাজে কল্যাণ আছে, সেই কাজগুলো করবেন।

আর স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক নয়। স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ এবং কল্যাণকর হয়, যখন এর সাথে কোনো লক্ষ্য থাকে এবং জবাবদিহিতা থাকে। তাই কোয়ান্টাম জীবনচারণ অনুশীলন করুন। নিজের ও অন্যের কল্যাণে সুশৃঙ্খল ও স্বাধীনভাবে কাজ করুন।

প্রশ্ন : ছোটবেলা থেকেই আমি খুব নার্ভাস প্রকৃতির। ক্রিকেট খেলায় যখন ব্যাটিং করতে নামতাম, খুব জোরে বুক ধুকধুক শুরু হতো। শরীর নিস্তেজ হয়ে যেত, খেলতেই পারতাম না। এরপর জেদ করে আড়াই বছর খেলেছি কিন্তু নার্ভাসনেস দূর হয় নি। শুধু খেলায় নয়, যখন কারো সাথে কোনো ঝামেলা হতো, তা সমাধানের জন্যে যখন বিচার বসত তখনও এত নার্ভাস হয়ে পড়তাম যে, কথাই বলতে পারতাম না। এমন অনেক উদাহরণ আছে। এ-ছাড়া আছে প্রচণ্ড মানসিক দুর্বলতা। কোনো ভুল করলে সেটা নিয়ে সারাক্ষণ অনুতাপ করতে থাকি। এ সমস্যাগুলো কি ভালো হবে? ভালো হওয়ার জন্যে কী করতে হবে?

উত্তর : ভালো হওয়ার জন্যে লেগে থাকতে হবে, ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্যাগুলো দূর হয়। সবচেয়ে ভালো হয়-আপনি যদি ৪০ দিনের জন্যে লামায় খেদমতায়নে চলে যান। এর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হলে তো খুব ভালো, তা না হলে আরো ৪০ দিন।

কারণ ওখানে আপনি এত ব্যস্ত থাকবেন যে, নার্ভাস হওয়ার কোনো সুযোগই পাবেন না। আর দীর্ঘদিন ধরে নার্ভাসনেস ও মানসিক দুর্বলতার মধ্যে থাকতে থাকতে আপনার মনে ও চিন্তা-চেতনায় এক ধরনের জট পাকিয়ে গেছে। এই জট খোলার জন্যে মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনচর্চা আপনাকে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি কিছুদিন একটি নির্দিষ্ট রুটিনমাসফিক শারীরিক পরিশ্রম আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। জীবনে নতুন ছন্দ নিয়ে আসবে।

সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হবে ইতিবাচক অনুরণন। তাই খেদমতায়ন থেকে ফেরার পরও নিয়মিত মেডিটেশন, কোয়ান্টাম ইয়োগা ও অটোসাজেশন চর্চাসহ (আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী আমি পারি আমি করব আমার জীবন আমি গড়ব) সুস্থ জীবনযাপন অব্যাহত রাখবেন। নার্ভাসনেস ও মানসিক দুর্বলতা কেটে যাবে ইনশাল্লাহ।

আর নার্ভাস হবেন কেন? কেন এত ভয় পাবেন? বড়জোর মারা যাবেন, এই তো! আর কী হবে? মারা তো একদিন যাবেনই। মৃত্যু যখন আসার তখন সে আসবেই। যেখানে মৃত্যু লেখা আছে, সেখানেই মৃত্যু

হবে। অতএব ভয় কীসের? মনে রাখবেন, একজন ধ্যানী সবসময় আত্মবিশ্বাসী। তিনি তার লক্ষ্যটা জানেন। আত্মবিশ্বাসী ও লক্ষ্য-সচেতন মানুষ কখনো ভয় পান না, নার্ভাস হন না।

প্রশ্ন : জীবন ও বাস্তবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে এবং প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে যে সাহস বিশ্বাস ধৈর্য দরকার, সেটা কীভাবে বাড়াতে পারি?

উত্তর : নিয়মিত মেডিটেশন করবেন এবং সৎসঙ্গে একাত্ম থাকবেন। এই সজ্ঞবদ্ধতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ কেন শোষিত, লাঞ্ছিত ও ভীতসন্ত্রস্ত? কারণ তারা বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল অর্থাৎ সজ্ঞবদ্ধ নয়।

আমরা জানি, জ্ঞানই শক্তি। আসলে জ্ঞান কখনো শক্তি হতে পারে না, যদি না তা অন্যের সাথে শেয়ার করা হয় এবং অনুশীলন করা হয়। আর এটা সম্ভব সজ্ঞবদ্ধতার মধ্য দিয়ে। সজ্ঞবদ্ধতা আপনার সাহস, বিশ্বাস ও ধৈর্য বাড়াবে। এর পথ ধরেই আপনি জীবন ও বাস্তবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং অতিক্রম করবেন যাবতীয় প্রতিকূলতা। আর যদি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন থাকেন, তাহলে সাহস বা ধৈর্য-কোনোটাই আপনার বাড়বে না। আপনি হারিয়ে যাবেন। হতাশায় ডুবে যাবেন।

তাই যারা সত্যের পথে শান্তির পথে মুক্তির পথে ভালো পথে চলতে চান, তাদের সবসময় সজ্ঞবদ্ধ হতে হবে। সম্পৃক্ত থাকতে হবে সজ্ঞের সাথে। এজন্যে প্রতি শুক্রবার সাদাকায়নে যাবেন, জ্ঞান ও উপলব্ধি বিনিময় করবেন। যা সত্য বলে জানলেন, সেটা চারপাশের মানুষের কাছে বলবেন। তখন জানাটা আপনার জন্যে শক্তি হবে।

প্রশ্ন : আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার কাছ থেকে ভালবাসার বিনিময়ে প্রতারণা পেয়েছি। আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষের কাছে টাকা দিয়ে ধোকা খেয়েছি। ভালবাসা ও টাকা, দুটো থেকেই বিশ্বাসঘাতকতা পেয়েছি। মাঝে মাঝে জীবনটা কেমন যেন এলোমেলো লাগে, তবু হাল ছাড়ি নি। আমার মা বলেন, নিরাশ হয়ো না, যা হয়েছে হয়তো তোমার ভালোর জন্যে হয়েছে। কথটা কি ঠিক?

উত্তর : অবশ্যই ঠিক। আপনার মায়ের সাথে আমি একমত-যা হয়েছে ভালোর জন্যে হয়েছে। যে পাখি উড়ে গেছে সেটা আপনার না। বিয়ের পরে যদি চলে যেত তখন তো আরো বেশি কষ্ট পেতেন।

আর এ ধরনের বোকামি করবেন না। প্রেমিককে টাকা দেয়ার মতো আহাম্মক কোনো মহিলা হবেন না। যে ছেলে কোনো মেয়ের কাছে টাকা ধার চায়, সে আসলে পুরুষ নয়। বুঝবেন, সে প্রথম সুযোগেই আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। টাকা পেয়ে আর আপনার দিকে তাকিয়ে লাভটা কী? সে তখন আরেকজনের পেছনে ছুটবে। অতএব কোনো মেয়ে প্রেমে পড়ে কাউকে আর্থিক সাহায্য করবেন না। তাহলে টাকাও যাবে, প্রেমও যাবে।

আবার এক ধরনের ছেলেদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে- তারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে এবং বড়লোকের মেয়ে খোঁজে। তারপর নিজের দুর্দশার কথা বলে। এদিকে মেয়ে তো ধনীরা দুলালি, মা-বাবার টাকা দিতে কোনো

কষ্ট নেই। কারণ এগুলো তার কষ্টার্জিত টাকা নয়।

তাই অর্থনৈতিক লেনদেন বা নির্ভরতা শুরু হলেই বুঝবেন আসলে এটা পছন্দ না, আপনি হলেন তার টাকার উৎস। সবসময় মনে রাখবেন, প্রতারণা করা অপরাধ কিন্তু প্রতারণিত হওয়া অসম্মানের। তাই সচেতন থাকবেন, নিজের সম্মান বজায় রাখবেন। আবেগের বশে আহাম্মক হবেন না। আমরা দোয়া করি যেন আপনি কষ্টগুলো ভুলে যেতে পারেন।

প্রশ্ন : অনেকদিন ধরে আমার মনে একটি সংশয় কাজ করছে। মেডিটেশন শেষে বলা হয়-‘আমি এক অনন্য মানুষ। আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম। সারা পৃথিবী আমার। যেখানে দরকার সেখানে যাব।’ এই প্রত্যয়ন করার সময় আমার মনে হয়-এই পৃথিবী তো আমার না, এটা সৃষ্টিকর্তার। তাহলে আমি কি শিরক করছি?

উত্তর : শিরক সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে কত সংকীর্ণ তা এ প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়। এই যে আমরা বলি-আমার গাড়ি আমার বাড়ি, কেউ তো বলে না যে, সৃষ্টিকর্তার বাড়ি! গাড়ি বাড়ি যদি আপনার হতে পারে, তাহলে পৃথিবীটা আপনার হতে অসুবিধা কী?

কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা খুব পরিষ্কার বলেছেন, ‘নামাজ শেষ হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করো।...’ (সূরা জুমআ, আয়াত ১০) জমিন বলতে শুধু আপনার ধানক্ষেতটুকু না, জমিন বলতে এখানে পুরো পৃথিবীকে বোঝায়। অর্থাৎ অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পুরো পৃথিবীই আপনার।

কারণ আল্লাহ মানুষকে ছড়িয়ে পড়তে বলেছেন। যদি তা না হতো, তাহলে আল্লাহ এই নির্দেশ দিতেন না। যখন আপনি আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড়ছেন এবং বলছেন-সারা পৃথিবী আমার, তখন আপনি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন। সেইসাথে মনটাকে বড় করছেন।

তবে কী উদ্দেশ্যে আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড়বেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ‘সারা পৃথিবী আমার’ বলে আপনি কি পুঁজিপতিদের মতো হবেন? কয়েকজন মিলে পৃথিবীর অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবেন? অর্থাৎ আপনি শোষণ করবেন নাকি মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন, এই দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিষ্কার থাকতে হবে। কারণ শোষণের মধ্য দিয়ে অর্থবিত্ত ও ক্ষমতা আসতে পারে কিন্তু প্রশান্তি আসে না।

মনে রাখবেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করার নামই হচ্ছে শিরক। কারণ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো ওপর নির্ভর করেন না। কোরআনের বাংলা মর্মবাণী পড়বেন এবং বিষয়গুলো সম্বন্ধে নিজের ধারণাটা স্পষ্ট করবেন। তাহলে সত্যটা আপনি বুঝতে পারবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

ভালো জিনিসকে আমি পুরোপুরি গ্রহণ করব। তাহলেই আমি এ থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারব।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে ব্লাড ক্যাম্প ১৫টি ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ ৪৯৭ ব্যাগ রক্ত

১৮ ডিসেম্বর
সুপ্রীম কোর্ট
দিবস উপলক্ষে
কোয়ান্টাম
স্বেচ্ছা রক্তদান
কার্যক্রমের
সহযোগিতায়
সুপ্রীম কোর্ট
প্রাঙ্গণে
আয়োজিত হয়
একটি ব্লাড
ক্যাম্প। মহান
মুক্তিযুদ্ধে
শহিদদের
স্মরণে অনুষ্ঠিত
ক্যাম্পটি
উদ্বোধন করেন
প্রধান
বিচারপতি
সৈয়দ মাহমুদ
হোসেন।



১০ ডিসেম্বর ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় দিনব্যাপী রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এতে রক্তদান করেন ৬৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। ব্লাড ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি।



১৯ ডিসেম্বর এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)-এর প্রধান কার্যালয়ে (তেজগাঁও) ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এটি উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির।



১৫ ডিসেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজে অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্পে রক্তদান করেন কলেজের ৯০ জন শিক্ষার্থী। উল্লেখ্য, এদের অধিকাংশই জীবনে প্রথমবারের মতো রক্ত দেন। ব্লাড ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যাপক মো. আবু সাইদ।

দেশজুড়ে ধ্যানসন্ধ্যা ও ধ্যানপ্রভাত



দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত
১২টি ধ্যানসন্ধ্যা ও ধ্যানপ্রভাতে
অংশ নিয়েছেন ১২ সহস্রাধিক মানুষ

২৩ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত গুরুজীর পরিচালনায় দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ধ্যানসন্ধ্যা ও ধ্যানপ্রভাত। ১২টি আয়োজনে অংশ নিয়েছেন কোয়ান্টাম পরিবারের ১২ সহস্রাধিক সদস্য। এবারের মূল বিষয় ছিল : সুখী জীবনের পথে বাধা ও উত্তরণের প্রক্রিয়া। এতে অংশগ্রহণকারীদের সচেতন করে তোলা হয়েছে আত্মসী পণ্যদাসত্ব, ক্রেডিট কার্ড, ঋণ ও কিস্তির ফাঁদ সম্পর্কে।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে এসেছে ২০০ নতুন শিশু



বর্ধিত শিশুদের শিক্ষালয় বান্দরবান, লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। ক্রীড়ায় পর পর দুই বছর দেশসেরা, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা দিবস প্যারেডে পর পর চার বছর প্রথম স্থান অর্জন করেছে এই প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি পড়াশোনায়ও ধারাবাহিকভাবে ভালো করেছে এর শিক্ষার্থীরা। এবছর বুয়েট, সরকারি মেডিকেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে কসমো কলেজের ২৩ জন শিক্ষার্থী।

প্রতি বছর সারা দেশ থেকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় এ স্কুলে। উদারনৈতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আবহে এ শিশুরাই হয়ে ওঠে মানব সম্পদ। এবছর এমনই আরো ২০০ শিশু এখানে ভর্তি হয়েছে; যাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

এতিমান ফান্ড ৯ আপনিও এগিয়ে আসুন

দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আলোকিত মানুষ হওয়ার সুযোগ দিতে চায় কোয়ান্টাম। এতে অংশ নিন আপনিও। আপনার দানে এই শিশুরা গড়বে আলোকিত জীবন। এখানে একজন শিশুর জন্যে প্রতি মাসে খরচ হয় প্রায় আট হাজার টাকা। আপনার সামর্থ্য অনুসারে এক বা একাধিক শিশুর দায়িত্ব নিন। কয়েকজন মিলেও এ দায়িত্ব নিতে পারেন।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন : ০২-৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

আগে জানুন, আপনার দানের অর্থ কী হচ্ছে

আমাদের দেশে যাদের শিক্ষা করতে দেখা যায়, এদের প্রায় সবাই পেশাদার ভিক্ষুক। তাদের সুনিপুণ অভিনয়ে প্রচারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাই সচেতন হতে হবে। কারণ আপনার দানের অর্থ কী কাজে লাগছে, সেই জবাবদিহিতাও আপনার ওপরই বর্তায়।



নাম হাজী কামাল শেখ। হাতে ব্যান্ডেজ। রক্ত মাখানো। রাজধানীর রমনা পার্কের সামনে বসে ভিক্ষা করছিলেন।

অনেকেই তাকে ভিক্ষা দিচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তার হাতে আসলে কিছুই হয় নি। পেটের দায়ে হাতে ব্যান্ডেজ করে লাল আলতা রং মেখে ভিক্ষা করছেন।

আগে হাত পেতে ভিক্ষা করতেন। আয় ভালো হতো না। তখন তার দৈনিক আয় ছিল ২০০-৩০০ টাকা। ব্যান্ডেজ লাগানোর পরই ভাগ্য ফিরল। প্রতিদিন অনায়াসে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা আয় হয়। নতুন নতুন এলাকায় গেলে আয় বেড়ে যায়। এক এলাকায় এক মাসের বেশি থাকেন না।

তার বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে। বউ-ছেলেমেয়ে সব গ্রামেই থাকেন। তার চার স্ত্রী। গ্রামের এক বাড়িতেই থাকেন চার জন। ভিক্ষা করে প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা পাঠান। আর বাকি টাকা তিনি নিজের কাছেই রাখেন। চার ঘরে ১০ সন্তান। ছয় ছেলে, চার মেয়ে। এর মধ্যে চার ছেলে বিদেশে। দুই ছেলে গ্রামেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। চার মেয়েরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ভিক্ষা করায় এ পেশা ছাড়তে পারছেন না তিনি।

তার স্বপ্ন ভিক্ষা করেই ঢাকা শহরে বাড়ি করবেন। কারণ তাকে যিনি ভিক্ষা করে অধিক

ধনাত্য ভিক্ষুক

উপার্জনের পথ দেখিয়েছেন, তার এখন ঢাকা শহরে একাধিক বাড়ি। তাই হাজী কামাল শেখ চান ঢাকা

শহরে তার প্রতিটি ছেলের নামে একটি করে ফ্ল্যাট থাকবে। কারণ সোনাইমুড়ীর এক ভিখারি ভিক্ষা করে ধনী হয়ে ইউপি মেম্বর পদে নির্বাচন করেছেন। তিনি দুবার হজ করেছেন। তাই নামের আগে হাজী। দুবারই ভিক্ষার টাকায়।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, বাংলাদেশে ভিক্ষুকের আয় নির্ভর করে তাদের শারীরিক আবেদন ও অভিনয়ের দক্ষতার ওপর। আপনি কোনো ভিক্ষুককে দেখবেন না রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডাল-ভাত খাচ্ছে। তারা মুরগি বা গরু ছাড়া ভাত খায় না। আর আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ টাকা বাঁচানোর জন্যে কখনো কখনো ভাত না খেয়ে রুটি-সবজি খাই। যারা রিকশা চালক বা দিনমজুর, তারা পাঁচ টাকার রুটি আর পাঁচ টাকার এক কাপ চা খেয়ে সারাদিন রিকশা চালান।

ভিক্ষাবৃত্তি হলো বিনা পুঁজিতে ব্যবসা, আর কেউ যদি হাজী কামালের মতো ব্যান্ডেজ আর লাল আলতায় পুঁজি বিনিয়োগ করেন, তাহলে তো কোনো কথাই নেই।

তথ্যমতে, বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ ভিক্ষুক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করেন। সর্বনিম্ন দুই মাস থেকে দুই বছর পর নির্দিষ্ট এলাকা পরিবর্তন করেন।

তথ্যসূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ ডিসেম্বর ২০১৮